বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

৫ শ্রাবণ ১৪১৮
২০ জুলাই ২০১১

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল মৎস্যজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান ও গুরুত্ব অপরিসীম। খাদ্য নিরাপত্তায়ও জলজ জীবসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশের আপামর জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচনসহ রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও মৎস্য খাতের অবদান অনস্বীকার্য। দেশের মৎস্য সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন সাধন, সমন্বিত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নততর পদ্ধতিতে পরিকল্পিত উপায়ে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। দেশীয় মৎস্য সম্পদ রক্ষায় মাছের অভয়ারণ্য সৃষ্টি, পোনা উৎপাদন ও সংরক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ বছরের প্রতিপাদ্য, 'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বদলে দেব বাংলাদেশ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে মৎস্যখাতের উন্নয়ন জরুরি বলে আমি মনে করি। আমি সম্ভাবনাময় এ খাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১১' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৫ শ্রাবণ ১৪১৮
২০ জুলাই ২০১১

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দেশে 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১১' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ দিবস উপলক্ষে এ বছরের প্রতিপাদ্য 'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ , বদলে দেব বাংলাদেশ' মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় মাছ আবহমান বাঙালির সংস্কৃতির একটি অংশ। মাছ প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তাছাড়া মাছ শরীরের পুষ্টি যোগানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় যা সুস্থ ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে অপরিহার্য।

প্রাকৃতিক জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, জলজ জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। যুগোপযোগী, পরিবেশ-বান্ধব, বিজ্ঞান ভিত্তিক ও উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্যচাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে এর অপরিকল্পিত আহরণ বন্ধ ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১১' উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা
৫ শ্রাবণ ১৪১৮
২০ জুলাই ২০১১

বাণী

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন, অত্মকর্মসংস্থান এবং আমিষের চাহিদা পূরণে এ খাত আবহমান কাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। উন্নত ও সহজপাচ্য আমিষ, অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড, ভিটামিন ও খনিজ লবণে সমৃদ্ধ হওয়ায় জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে ও সুস্থ জাতি গঠনে মাছ অত্যন্ত উপযোগী একটি খাদ্য। সেকারণে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মৎস্য খাতের সার্বিক উন্নয়ন সাধন জরুরী।

বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার মৎস্য খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ভিত আরও মজবুত করার জন্য এ খাতের প্রবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বাড়াতে হবে। এ জন্য ব্যাপক জনসচেতনতা ও জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তর ২০-২৬ জুলাই, ২০১১ সপ্তাহব্যাপী 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১১' উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১১' এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ দেশের জলজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি আশা করি। পাশাপাশি এ কার্যক্রমসমূহ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়েও জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করবে বলে আমার বিশ্বাস।

এবারের মৎস্য সপ্তাহের শ্লোগান "নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বদলে দেব বাংলাদেশ" এ শ্লোগানটি দেশের আপামর জনসাধারণকে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হবে। 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১১' এর সকল প্রয়াস সাফল্য মন্ডিত হোক এ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস,এমপি

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা
৫ শ্রাবণ ১৪১৮
২০ জুলাই ২০১১

বাণী

সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা আমাদের বাংলাদেশ মূলতঃ নদীমাতৃক গাঙ্গেয় বদ্বীপ। আমাদের দক্ষিণে বিশাল বঙ্গোপসাগর, পদ্মা-মেঘনা-যমুনাসহ অসংখ্য নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, খাল বিল, পুকুর-দীঘি ও বিচিত্র জলাশয়ে পরিপূর্ণ এ দেশ মৎস্য সম্পদের এক অফুরান ভান্ডার।

'মাছে ভাতে বাঙ্গালী' আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেশের প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ যোগান আসে মাছ থেকে। মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৩.৭৪ শতাংশ মৎস্য উপখাতের অবদান। রপ্তানী আয়ের প্রায় ৩ শতাংশ আসে এই উপখাত থেকে। দেশের জনগোষ্ঠির প্রায় ১০ শতাংশ এই খাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত একটি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতায় মৎস্য খাতও বিজ্ঞান ও গবেষণায় নব নব প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনায় সমৃদ্ধ হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে উন্নত মাছের ব্রুড সংরক্ষণ, মৎস্য হ্যাচারী ও নার্সারীজাত দ্রুত বর্ধনশীল মাছের রেনু ও পোনা উৎপাদন আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে এক নুতন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। মৎস্য চাষের নব নব উদ্ভাবনা ও প্রযুক্তি স্থানান্তর কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ের মৎস্য চাষী ও খামারীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফলে সারাদেশে মৎস্য উৎপাদন ব্যা পক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গ্রামীন দরিদ্র কৃষক ও মৎস্যচাষীগণ এর সুফল পেতে শুরু করেছেন। গ্রামীন দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নে তাই এ উপখাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আমাদের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিত অপার সম্ভাবনাময় মৎস্য উৎপখাতের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বর্তমান সরকার বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

আমাদের দেশে বর্তমানে জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব, নগরায়ন, শিল্পায়ন, মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে আমাদের জলাশয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হযে আসছে। কৃষিতে ক্ষতিকর কীটনাশকের যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ ও কারখানার দূষিত বর্জ্যে আমাদের প্রাকৃতিক ও মুক্ত জলাশয় ক্রমাগত দূষিত হচ্ছে। আর এই দূষণের অন্যতম শিকার হচ্ছে আমাদের মৎস্যসম্পদ।

এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বর্ণিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের এ বছরের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বদলে দেব বাংলাদেশ'। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের এই শ্লোগানকে সামনে রেখে দেশ জুড়ে জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, যুবক, মহিলা, বুদ্ধিজীবি, গবেষক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিকসেবী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, জেলে, মৎস্যজীবীসহ দেশের আপামর মানুষকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন আন্দোলনকে বেগবান করে তুলতে হবে।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আসুন, আমরা আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে নিরাপদ মৎস্য চাষের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে দেশের জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে স্বাস্থ্যবান, প্রাণবন্ত, উদ্যমী ও মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তুলি।

আমি 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১১ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত

মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কৌশল ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ

মোঃ মাহবুবুর রহমান খান
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। জাতীয় অর্থনীতিতে এ সম্ভাবনাময় সেক্টরের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে। বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০০৯-১০ আর্থিক সালে ২৮.৯৯ মে. টন মৎস্য উৎপাদন হয়েছে, যা মোট জিডিপি'র ৩.৭৪ শতাংশ, কৃষিখাতে অবদান ২২.২৩ শতাংশ এবং রপ্তানি আয়ে অবদান ২.৭০ শতাংশ। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ১০ শতাংশ তথা প্রায় ১.৪৫ কোটি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। মৎস্য খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষতা সাধনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর নিয়মিত রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত তিন বছরে মৎস্য উপখাতে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৯ শতাংশ। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জিতব্য নির্দিষ্ট আটটি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা আনয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন অন্যতম। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে মৎস্য উপখাতকে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দরিদ্র-বান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কৌশলপত্রে বর্ণিত কৌশলগত লক্ষ্যগুলো হলো- ক. অভ্যন্তরীণ মাছ চাষে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; খ. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; গ. দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধি; ঘ. ধানক্ষেতে ও মৌসুমী জলাশয়ে মাছ চাষ অধিকতর সম্প্রসারণ; ঙ. সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় জলাশয়ে মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; চ. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং ছ. মৎস্য গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ ইত্যাদি।

মৎস্যসম্পদের উৎস ও মৎস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ জলসম্পদ ও প্রাণিবৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এদেশের মূল ভূখণ্ডের প্রায় সর্বত্রই নদী-নালা, খাল-বিল জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে। দেশব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য পুকুর-দিঘি, ডোবা-নালা, হাওর-বাঁওড় ও প্লাবনভূমি। এছাড়াও রয়েছে বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের আয়তন ৪০.২৪ লক্ষ হেক্টর (৮৬.৫%) এবং অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ের আয়তন ৬.২৮ লক্ষ হেক্টর (১৩.৫%)। এক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বিগত ১০ বছরের মৎস্য উৎপাদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল প্রায় ১৭.৮১ লক্ষ মে. টন। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ২৮.৯৯ লক্ষ মে. টন। উন্নততর প্রযুক্তির সাথে সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত সম্প্রসারণ কর্মীগণের চাহিদামাফিক ও সার্বক্ষণিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ফলে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি ২০১০-১১ বছরে মৎস্য উৎপাদন ৩১.০০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনায় উৎপাদন প্রক্ষেপণ ও মাছের চহিদা

২০০৯-১০ সালে দেশে মোট ২৮.৯৯ মে. টন মাছ ও চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে। চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন বাড়াতে হলে অধিক হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। বিদ্যমান প্রবৃদ্ধির হার বাড়িয়ে ২০১০-১১ সালে ৩১.০ লক্ষ মে. টন, ২০১৪-১৫ সাল নাগাদ ৩৬.৬৫ লক্ষ মে. টন এবং ২০২০-২১ সাল নাগাদ ৪১.৩৯ লক্ষ মে. টন মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হলে দেশের অভ্যন্তরীণ মাছের চাহিদা পূরণ করেও ২০১৪-১৫ ও ২০২০-২১ সাল নাগাদ যথাক্রমে ১.২৫ লক্ষ মে. টন ও ২.২৯ লক্ষ মে. টন উদ্বৃত্ত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্ষেত্রসমূহ

ক. প্রবাহমান নদী ও জলমহালে জৈবিক ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন : রাজস্বভিত্তিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে উৎপাদন পরিকল্পনাভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলমহালে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, প্রাকৃতিক প্রজনন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযোগী স্থানে অভয়াশ্রম স্থাপন, মাছের প্রজননক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ ও পুনঃখনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, প্রবাহমান নদীর মৎস্য আহরণ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যেমৎস্যজীবীদের অধিকারপত্র প্রদান, বিল নার্সারি ও পোনা মজুদ কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং পেনে ও খাঁচায় মাছ চাষ সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

পোনা মাছ অবমুক্ত ও বিল নার্সারি কার্যক্রম : পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে গত ২০১০-১১ অর্থ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্প হতে প্রায় ৮.০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যেই বিল নার্সারি নীতিমালা ২০০৯ প্রণীত হয়েছে। গত অর্থ বছরে বিল নার্সারি স্থাপনের জন্য রাজস্বখাতে প্রায় ৬১.০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় দেশের ৮০টি বিলে ৩৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিল নার্সারি স্থাপনের ফলে উন্মুক্ত জলাশয়ে অতিরিক্ত ২০০০ মে. টন মাছ উৎপাদিত হয়।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন : মৎস্য সংরক্ষণ আইনের যথাযথ ও কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে দেশীয় কার্প ও অন্যান্য ছোট ছোট প্রজাতির মাছের প্রজনন ও বর্ধন নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যকরী উদ্যোগের সাথে সাথে অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগীতায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে পোনা মাছ ও জাটকা রক্ষা, কারেন্ট জালের অবৈধ ব্যবহার রোধ, ডিমওয়ালা মাছ ধরা রোধ, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা : আমাদের অভ্যন্তরীণ জলসম্পদের প্রায় ৬২ শতাংশ প্লাবনভূমি, যেখানে ৪ থেকে ৬ মাস মাছ চাষোপযোগী পানি থাকে। ষাটের দশকে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৮০ শতাংশ আসতো উন্মুক্ত জলাশয় হতে, বর্তমানে যা ৩৫ শতাংশে নেমে এসেছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে গত ২০০৯-১০ সালে দেশের ২৭৩৪ হেক্টর প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ করে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ২.৭০ মে. টন অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। আগামী ২০২০-২১ সালের মধ্যে প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে চাষ এলাকা ১.৭০ লক্ষ হেক্টরে উন্নীত করতে হবে। এতে দেশের মোট প্লাবনভূমির হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২০২১ সাল নাগাদ ৫০০ কেজিতে উন্নীত হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন : বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল হিসেবে ইতোমধ্যেই সুফলভোগীদের নিকট পরিচিতি লাভ করেছে। গত দশকের প্রথম দিকে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে প্রায় ৩৮০টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়। অভয়াশ্রম পরিচালনার কাংখিত সাফল্য দেখা যাওয়ায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী অন্যান্য উপযুক্ত জলাশয়ে অভয়াশ্রম স্থাপনের উদ্যোগ নেয় হয়। এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে ঐসব জলাশয়ে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি, যথা- চিতল, ফলি, কালিবাউশ, আইর, টেংরা, মেনি, রাণী, সরপুটি, মধু পাবদা, কাজলি, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে। এতে মৎস্য তথা জলজ জীব-বৈচিত্র্যে ভারসাম্য ফিরে আসতে শুরু করেছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়।

খ. পুকুর-দিঘিতে মৎস্যচাষ নিবিড়করণ :

বর্তমানে দেশের ৩.৫ লক্ষ হেক্টর পুকুর-দিঘিতে বার্ষিক হেক্টর প্রতি গড় মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৩.৫ মে. টন। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে চাষি প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সব পুকুর-দিঘি লাগসই মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হলে পুকুর-দিঘির ক্ষেত্রে এ উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৫.০ থেকে ৬.০ টনে উন্নীত করা সম্ভব। আগামী ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৪.০ মে. টনে উন্নীত করে মাছের চাহিদা পূরণে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

গ. জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। দেশে ২০০৯-১০ সালে ৩.১৩ লক্ষ মে. টন ইলিশ উৎপাদিত হয়েছে, যা মোট উৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশ। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় স্থিরকৃত মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও ভিজিএফ কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করে আপদকালীন খাদ্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লিখিত কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইলিশের প্রজননক্ষেত্রসমূহ রক্ষা এবং জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমের ফলে ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ইলিশের উৎপাদন যথাক্রমে ৩.৪০, ৩.৬০ ও ৪.০০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

ঘ. পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ

চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয়অঞ্চলে চিংড়ি খামারের সংখ্যাও দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফলে কয়েক বছরের ব্যবধানে চিংড়ি খামারের আয়তন ৬৪ হাজার হেক্টর হতে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টরে উন্নীত হয়েছে। এ সমস্ত চিংড়ি খামারের উৎপাদন ১৯৯৯-০০ সালে ০.৯২ লক্ষ মে. টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৯-১০ সালে ১.৫৭ লক্ষ মে. টনে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, চাষি প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১১ (অনুমোদনের অপেক্ষাধীন) মোতাবক বাস্তবায়ন করা হলে ২০২০-২১ সালে চিংড়ি খামার থেকে মোট উৎপাদন প্রায় ২.১০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এতে করে চিংড়ি রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া উপকূলীয় ইজারাকৃত বিভিন্ন আয়তনের চিংড়ি খামার থেকে সরকারের রাজস্ব আয়ও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঙ. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন মূলত আহরণ নির্ভর। উপকূলব্যাপী ৭১০ কিমি দীর্ঘ তটরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত ১.৬৬ লক্ষ বর্গ কিমি বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের বিশাল সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসম্পদে ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি এবং ৪৭৫ প্রজাতির মাছ রয়েছে। গত ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বঙ্গোপসাগর হতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রল ফিশিং-এর আওতায় ০.৪০ লক্ষ মে. টন এবং আর্টিসেনাল মৎস্য আহরণের মাধ্যমে ৪.৭৯ লক্ষ মে. টনসহ মোট ৫.২৮ লক্ষ মে. টন মৎস্য আহরণ করা হয়েছে। যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত প্রায় ২.৭০ লক্ষ মৎস্যজীবীর পরিবারের ন্যূনতম ১৩.৫০ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে উপকূলীয় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মাধ্যমে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য খাত ইতোমধ্যেই ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ হতে গুণগত মানসম্পন্ন হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, হংকং, সিংগাপুর ও সৌদি আরবসহ অন্যান্য উন্নত দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। গত ২০০৯-১০ সালে ৭৭৬৪৩ মে. টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয়েছে ৩৪০৮.৫২ কোটি টাকা। তাছাড়া ২০১০-১১ অর্থ বছরের মে ২০১১ পর্যন্ত ৯০৮৯০ মে. টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৪১৭৫.৩০ কোটি টাকা। পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানির এ ক্রমধারা ধরে রাখতে পারলে ভবিষ্যতে এ সেক্টর হতেই কয়েক হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন

সমাজের সুবিধা-বঞ্চিত, বিশেষ করে দরিদ্র ও দুস্থঃ নারী, যাঁদের পুকুর/ডোবা আছে বা মাছ চাষ করার জন্য অনুরূপ কোন উৎসে অংশগ্রহণের সুযোগ আছে, তাঁদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল স্রোতধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ২৫-৩০ শতাংশ সুফলভোগী নারীদের মাঝ থেকে নির্বাচন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় নিয়োজিত কর্মীর প্রায় শত ভাগই নারী।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রম

দেশের মৎস্য সম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সদ্য সমাপ্ত ২০১০-১১ অর্থ বছরে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২৩টি উন্নয়ন প্রকল্প ও ২টি কর্মসূচির জন্য প্রায় ১৩০.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য মোট ২২টি উন্নয়ন প্রকল্প ও ২টি কর্মসূচির জন্য মোট ১৮৪.০০ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। এছাড়াও ২০১১-১২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ২৫ টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৎস্য সেক্টর

জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অন্যতম। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতাই এর মূল কারণ বলা যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মৎস্য খাতও আজ হুমকির মুখে। এর প্রভাবে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পানি শুকিয়ে গিয়ে মাছের আবাসস্থল কমে যাচ্ছে, সংকটাপন্ন হয়ে পড়ছে মাছের বংশ বিস্তার। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবসমূহ মোকাবেলা করে দেশের মৎস্য সম্পদ বাড়ানোর লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

মৎস্য সেক্টরে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ, তথ্যের আদান-প্রদান ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিজস্ব ওয়েব-সাইট (www.fisheries.gov.bd) পরিচালনার সাথে সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে Personnel Information Management System (PIMS) নামে একটি সফটওয়ার প্রস্তুতির কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যক্রমের প্রতিবেদন তাৎক্ষণিকভাবে সংগ্রহ এবং কার্যকরভাবে একীভূত ও প্রক্রিয়াজাত করার লক্ষ্যে MIS of DOF নামে একটি সফটওয়ার চালুর অপেক্ষায় রয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা কাজে লাগিয়ে মাছ ও চিংড়ি চাষিদের চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সেবা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানের লক্ষ্যে ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় দেশের ১০টি জেলার ১০টি উপজেলা ও ১০টি গ্রামে e-Extension Service for Need based Aquaculture Extension শীর্ষক পরীক্ষামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আশা করা যায় এ কর্মসূচি দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে অধিকতর সামর্থ্যবান করে তুলবে।

নিরাপদ মাছ ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্য (safe food) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশী ও বিদেশী ভোক্তাদের জনস্বাস্থের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মৎস্য ও চিংড়ির গুণগতমান বজায় রাখার নিমিত্ত বাংলাদেশে যুগোপযোগি একাধিক আইন, বিধিমালা ও পলিসি গাইডলাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে - যেমন : মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩। মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৮, সংশোধিত ১৯৯৭। মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০। মৎস্য খাদ্য বিধিমালা ২০১১ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১ প্রক্রিয়াধীন। মৎস্য সংগনিরোধ আইন ২০১১ প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। জাতীয় রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পলিসি গাইডলাইন ২০০৮ সাল হতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া দেশের মৎস্য ও চিংড়ির রাসায়নিক দূষণ প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটি (NWC) ২০০৯ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

উপসংহার

প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ, জৈবিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন, আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চাষ পদ্ধতির নিবিড়করণ, সকল ধরনের জলজ সম্পদ ও তথ্য প্রযুক্তি কার্যকরভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন আগামী ২০১৪-১৫ সাল নাগাদ ৩৬.৬৫ লক্ষ মে. টন এবং ২০২০-২১ সাল নাগাদ ৪১.৩৯ লক্ষ মে. টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১-এর প্রতিপাদ্য নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বদলে দেব বাংলাদেশ শ্লোগানকে সামনে রেখে মৎস্য অধিদপ্তর সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় দেশের মৎস্য সম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য মাছে-ভাতে বাঙ্গালী-এ গৌরব পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রোটিন চাহিদা মিটাতে সচেষ্ট থাকবো।

সৌজন্যে : WorldFish CENTER